ভালো আমেরিকা কালো আমেরিকা

ত্রিদিব সেনগুপ্ত

'লগান' দেশপ্রেমের সিনেমা। 'বারবার হাঁ/ বোলো ইয়ার হাঁ/ আপনি জিত হো/ উনকি হার হাঁ'। এই দেশপ্রেম একটা বাইনারি ভুবনের দেশপ্রেম যেখানে আমার নেটিভের জয় মানেই অন্যের সাহেবের হার। শেষ অব্দি ওতে জিতল তৃতীয় বিশ্বের কলোনির গরীব আমীর — সেই খেলায়, খেলাটার নাম ক্রিকেট, ইংরেজের আনা খেলা। ইংরিজি কালচারের অংশ। হেড আই উইন, টেল ইউ লুজ। যেই জিতুক, খেলাটার নাম ক্রিকেট, খেলাটা ইংরেজের।

আমীরের বেশ কিছু বছর আগে আর একজন বাংলায় কিছু অনন্য হাস্যরস সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর লেখায়। তার সেই অতুলনীয় গল্পগুলোর একটার নাম 'উলট-পুরাণ'। যে গল্পে ইংরেজরা হল কলোনাইজড নেটিভ আর তাদের শাসনকর্তা প্রভুর নাম ভারত। ইংরেজ কচিরা বিদ্যাচর্চা করছে বাংলায় অনুবাদ করে যেমন আমরা শিখি ট্রান্সলেশন। মেডিটেরানিয়ানের নয়া নামকরণ হল মেতিপুকুর, যেমন আমাদের চুঁচড়ো ইংরেজের জিভে হয়ে গেছিল চিনসুরাহ । ইংরাজ ভদ্রজনেরা ঘাম ঝরিয়ে কাছা দিতে শিখছে যেমন আমাদের পাতিসাহেবরা গলায় জাঙ্গিয়া পরতে শিখেছে টাইয়ের নট দিয়ে। লালমুখো সাহেব আম আর আনন্দনাড়ু খাচ্ছে যেমন আমরা শিখেছি বিস্কুট আর জ্যাম।

আগের প্যারাগ্রাফের শেষ চারটে বাক্যেই দেখুন — মাঝামাঝি জায়গায় একটা করে 'যেমন' আর তার পর একটা তুলনা। রাজশেখর ঠিক সেই সেই ক্রিয়াগুলোকেই উল্টে দিচ্ছেন যেগুলো আমাদের ঔপনিবেশিক ইতিহাসের অংশ — ঠিক ওই ক্রিয়ার বিপরীতগুলোই আমরা করেছি ইংরাজ শাসনের আওতায়। রাজশেখর একটা ফ্যান্টাসি বা কল্পনা বানাচ্ছেন, যেমন 'আমি যখন বাবা আর বাবা যখন আমি', শাসনক্রিয়ার গতিমুখটাকে উল্টে দেওয়ার ফ্যান্টাসি। ইংরেজ শাসনকে উল্টে দেওয়ায় ইংরেজ-শাসিত আমরা ঠিক যা যা করতে বাধ্য হয়েছি বা করেছি তাই তাই এবার করছে ভারত-শাসিত ইংরেজ। কিন্তু মজাটা দেখুন, কাজগুলো রয়ে যাচ্ছে একই, মডেলটা রয়ে যাচ্ছে সেই ইংরেজের। ইংরেজ ঔপনিবেশিকের আদর্শে ভারতীয় উপনিবেশ। এই নতুন আমি-বাবা ঠিক আগের বাবার মতই, তারও একটা ছেলে থাকছে — বাবা-ছেলে। ছেলে আর বাবার সম্পর্কটা একই। মানে, খেলাটা রয়ে যাচ্ছে ইংরেজের। উপনিবেশ বদলাচ্ছে না।

উলট-পুরাণ থেকে লগান — আফ্রিকা থেকে এশিয়া তো ছেড়েই দিন, এইমাত্র আমরা যা দেখলাম ফ্যান্টাসির কল্পজগতও অ্যাটলান্টিস-ও বাদ থাকছে না, সব জায়গাতেই চিন্তার মননের বোধের তথা বাস্তবতার মডেল মাত্র একটাই। সেটা ওয়েস্ট মানে পশ্চিম। পৃথিবী জুড়ে ডিসকোর্স একটাই। ওয়েস্টের ডিসকোর্স। ক্ষমতার মাত্র একটাই ব্যাকরণ। তোমারই দেওয়া প্রাণে তোমারই দেওয়া দুখ — ক্ষমতাও পশ্চিমের মডেলে, ক্ষমতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মডেলও পশ্চিম। গোটা দেশপ্রেমিক আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের মডেলও ছিল ফরাসি বিপ্লবের মনন ও আদর্শ। আমাদের গোটা নবজাগরণটাই পাওয়া গেছিল এনলাইটেনমেন্টের বাংলা করে, মানে, বাংলায় এনলাইটেনমেন্ট করে।

গোটা এই গ্রহটা জুড়ে অধিকার করে আছে একটাই মনন, একটাই ভাষা। সেই ভাষাটা পশ্চিমের। সেটা একটা বাইনারি ভাষা। আলো আর অন্ধকার, সাদা আর কালো, ০ আর ১। এ অন্যের বিপরীত। একজনের জিত মানেই অন্যের হার। আপনি জিত হো, উনকি হার হাঁ। আর তার চেয়েও বড় কথা, গ্রহ জুড়ে এই দাবাখেলার ছকে সাদা সবসময়েই এক চাল এগিয়ে। সাদা আগে চাল দেয়। সাদার চাল দিয়ে স্থির হয়ে যায় কালো কী চাল দেবে, সাদার বিরুদ্ধে চাল দেয় কালো। সাদা দিয়ে কালো ডিফাইন্ড, সংজ্ঞায়িত। কালোর মধ্যেই তাই সাদা রয়ে যায়। কালো সেখানে জাস্ট আর একরকমের সাদা। লাদেন সেখানে আর এক রকমের বুশ।

সাদা আগে কালো পরে, বা, কালো মানে আর এক রকমের সাদা — এটা শুধু কথার কথা না, মননের মূল্যবোধের বাস্তবতার প্রতিটি স্তরেই এটা সত্যি। পূর্বের মানে তৃতীয় বিশ্বের শুধুমাত্র নিজের মত করে কিছু

করতে বা ভাবতে চাওয়ার পুরো পরিকল্পনাটাই অর্থহীন। পুরো বাস্তবতাটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে পশ্চিম, তাই এমনকী পূর্বের কোনো নিজস্বতা বা বিচ্ছিন্নতাকেও।

ডিসকোর্স পশ্চিমের, বাজারও তাই, গোটা বাস্তবতাটাই ওয়েস্ট-ব্র্যান্ড বাস্তবতা। কিন্তু পশ্চিম আর পূর্ব কোনো বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। ওয়েস্ট আর ইস্ট, সাদা আর কালো দুজনেই দুজনের মধ্যে মিশে যাচ্ছে, অতিনিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু অতিনিয়ন্ত্রণ মানেই সেখানে তারা সমান না, ওয়েস্ট যেভাবে ইস্টকে অতিনিয়ন্ত্রণ করে, ইস্ট সেই একই ভাবে ওয়েস্টকে করে না, ধরনদুটো আলাদা। ইস্টের চিন্তা বা বাণী বা সঙ্গীত ওয়েস্টে পৌঁছে দিতে হয় জ্যান্ত শারীরিকতায় — প্রফেসরকে বা শিল্পীকে ফাইল বা সেতার বয়ে বয়ে কালাপানি ঠেলে যেতে হয়। যেতে তাদের হয়ই। ইস্টে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যেই তাকে ওয়েস্টে যেতে হয়, বাবার অনুমোদন ছাড়া বাচ্চাদের জগতে প্রতিষ্ঠা আসবে কী করে? ইস্ট তো বাবাহীন হতে শেখেনি কখনো। আর উল্টোদিকে পশ্চিম রোজ দৈনিক প্রত্যহ পৌঁছে যাচ্ছে আমাদের খাওয়ার শোয়ার নাওয়ার ঘরে — প্যাকেটে ক্যাসেটে বইয়ে টিভিতে ইন্টারনেটে। পশ্চিমের শরীর না তাদের হাসিগুলো ছায়াগুলো পরিভ্রমণে আসে আমাদের পাঁচিলের এপারে।

অর্থাৎ, এই অতিনিয়ন্ত্রণের মধ্যেই একটা অসাম্য থাকে। একটা ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ। ওয়েস্ট সেখানে উপরে, ইস্ট নিচুতে। প্রথম বিশ্ব উপরে, তৃতীয় বিশ্ব নিচুতে। দুজনেই দুজনকে বদলাচ্ছি এর মানেই তো এই যে দুজনেই দুজনের সমান — আর অতিনিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ মানেই তো সমতাটা আর রইল না, হয়ে দাঁড়াল সমতার নাটক, অতিনিয়ন্ত্রণের অভিনয়।

এতো গেল মনন চিন্তন মূল্যবোধ — মানে, সাংস্কৃতিক বাস্তবতা। আর বাজার? অর্থনীতি? আমাদের কালো তৃতীয় বিশ্বের আবহমান অনাহারের ইতিহাস আমাদের তো কিছু এক্সট্রা ক্যালিও দিয়েছে, হাড়ে পেশিতে শিরায় কিছু বাড়তি জুত। যাতে একজন চিনে ভিয়েতনামি কোরিয়ান ভারতীয় বা আফ্রিকী শ্রমিক অনেক কম মাংস কম মদ কম ইয়েতেই অনেক শ্রম ভালো শ্রম দক্ষ শ্রম দিয়ে যেতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের সংযমী শ্রমিকের (সংযমটা চেয়েই হোক আর না-চেয়েই হোক) এই বাড়তি ক্যালি সঞ্জাত বাড়তি উদ্বৃত্ত বা সারপ্লাসের ঝোলটা কার কোলে যাবে? তৃতীয় বিশ্ব? না, তা কী করে হয়, ক্ষমতা আর তার নিয়ন্ত্রণ তাহলে আছে কেন? বুড়ো আঙুল চুষবে বলে?

সেই উদ্বৃত্ত তৃতীয় বিশ্ব ছেড়ে উড়ে যাবে উবে যাবে। ঠিক কোন দেশে তা আর বলা যাবে না। যেমন বলা যেত ঔপনিবেশিক ইতিহাসে — এই ব্রিটেনই সেই হারামজাদা, আমাদের মাল ভোগা দিয়ে খেয়ে গেল। এই অনামিকা উপনিবেশকেই আমাদের কিছু তাত্ত্বিক পোস্টকলোনি বা উত্তরউপনিবেশ বলতে ভালোবাসেন, তাতে তাদের বেশ আরাম হয়, হাঁটতে হাঁটতে আগের পোস্টেই মানে ল্যাম্পপোস্টেই কলোনিকে ফেলে এলাম, কত হাঁটতে পারি, বাবা দেখো আমি কত বড় হয়েছি, পুরো তোমার মত, এখন আমি তোমার সমান, তাই না? আর তো কোনো উপনিবেশ নেই, তাই না বাবা? সেমিনারে পেপারে চেয়ারে যত্নশীল কেয়ারিং বাবা সায় দেন, তাই সোনা, তাই।

এদিকে সেই নামহীন পরিচয়হীন লুণ্ঠন চলতেই থাকে। কখনো মাল্টিন্যাশনালরা ন্যাশনাল হয়, মানে তৃতীয় বিশ্বের ঘাটে ঘাটে একটা করে রাখেল পোষে, সেই লাইনে ওই উদ্বৃত্তরা পাড়ি দেয় বাইরে। আবার কখনো যায় অভিবাসী (মানে বাংলায় যাকে বলে ইমিগ্রান্ট) শ্রমিক মারফত। প্রথমবিশ্বের শ্রমিকদের চেয়ে কত কম খরচে পোষা যায় এই অভিবাসী মজুরদের। আবার যখন ইচ্ছে তাড়ানোও যায়। (ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে মৃত মানুষদের তালিকায় বোধহয় মার্কিনদের পরেই আছে এই অভিবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা।)

কিন্তু এই অনামিকা উপনিবেশগুলোয় মানে তৃতীয় বিশ্বে তাহলে ওই সমতার কী হল? সমতার আদি রূপকথাটাকে আমরা তো আগেই চিনে গিয়েছি। সাম্য গনতন্ত্র স্বাধীনতার সেই নবজাগরণবাদী সমতার রূপকথা নাম্বার ওয়ান, ফরাসি বিপ্লব যা ছড়িয়েছিল। পুঁজিতন্ত্রের কড়াইয়ে সেই রূপকথা শেষ অব্দি কী পিন্ডি চটকায় সেটা আমরা আগেই দেখেছি। সমতার সেই গল্প আর পপ সিনেমাতেও লোকজন খায় না

আর। বুড়ো ধর্মেন্দ্র রাজেশ দাড়ি কামিয়ে গালে পমেটম মেখে বুড়ি তাও ফ্রক পরা সায়রা বা মমতাজকে সাইকেল চড়ানোর সময় থেকেই সেই রিক্সাওয়ালা আর ক্যাপিটাল-নন্দিনীর প্রেম তাই সমতা মার্কা গল্প উঠে গেছে।

তাই এলো রূপকথা নাম্বার টু। পোস্টমডার্ন সমতা। আর কোথাও কোনো স্থির সত্তা নেই, সবই ছিন্নমূল, কোনো মৌলিক সত্তাই নেই কোনো কিছুর। আর তাই যদি হয়, তাহলে প্রভু নেই, ভৃত্য নেই, প্রভুত্ব নেই, ক্ষমতা নেই, অত্যাচার নেই। চালাও পানসি বেলঘরিয়া। আমরা সবাই সমান, কারণ আমরা কেউই আর কিছু নই। আমার থেকে তোমার, তোমার থেকে তার, তার থেকে আমার — যা আছে সবই পার্থক্য ডিফারেন্স। চারদিকে শুধু ক্ষমতারিক্ত প্রভুত্বরিক্ত পার্থক্যের খেলা।

উত্তরআধুনিকতার এই রূপকথা নাম্বার টু আসলে একটা অবগুণ্ঠন যা তার অভ্যন্তরে গোপন করে অনামিকা উপনিবেশের ক্ষমতানৃত্যকে। আমরা আপাতত ভুলে থাকি যে এই পৃথিবীর মনন চিন্তন ও বাস্তবতা আসলে সবই একটা খেলা যা শুরু করেছে সাদা। কালো যেখানে জাস্ট আর একরকমের সাদা। যেখানে উপনিবেশের সাবেক দর্শনীয় সৌধগুলো উপড়ে উপনিবেশ ছড়িয়ে পড়েছে আপনার বুকে আমার বুকে বাচ্চাদের ভাষাশিক্ষায় যুবকের যৌনতায় শিল্পীর তুলিতে শ্রমিকের কারখানায়। আমি আপনি আমরা সবাই সেখানে আমেরিকা। ভালো আমেরিকা কালো আমেরিকা বোকা আমেরিকা স্মার্ট আমেরিকা। কালাপাহাড় মন্দির ভেঙেছিল, শালগ্রাম শিলা ছড়িয়ে গেছিল ঘরে ঘরে। উপনিবেশ আর নেই, আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জ্যান্ত উপনিবেশ।

আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জ্যান্ত আমেরিকা। আমেরিকা — মানে পুঁজি, মানে রিজন উইথ এ ক্যাপিটাল আর, যুক্তি। যে যুক্তি এবং বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্তিতে আমাদের নিয়ে এসেছিল পুঁজি। কারণ তার নতুন বাজার দরকার ছিল। নতুন ভূগোল জয়ের জন্যে ছিল জাহাজের আর্মাডা, নতুন মাল বানানোর জন্যে দরকার ছিল বিজ্ঞান, নতুন ধরনের বাজারের গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্যে দরকার ছিল নৃতত্ব আর সাহিত্য। আর সেই বাজারে নতুন ভূগোলের নতুন মানুষের উপস্থিতিকে বাধ্যতামূলক করার জন্যে দরকার ছিল আলোকপ্রাপ্তির সংস্কৃতি। বাঙালি টুলো পণ্ডিতদের ধুতি আর খড়ম না ছাড়াতে পারলে সে ম্যাঞ্চেস্টারে তৈরি গলার জাঙ্গিয়া আর বাটার জুতো বেচবে কী করে? কিন্তু ওই ধুতি আর খড়ম একটা জীবন ও মনন পদ্ধতির অংশ — তাকে তাড়াতে গেলে ওই পদ্ধতিটাকে ভাঙতে হবে। শাস্ত্রীয় কুসংস্কারকে বদলে ফেলে আনতে হবে বাজারের কুসংস্কার — যার অন্য নাম রিজনেবল হওয়া, রিজন উইথ এ ক্যাপিটাল আর।

তাকে শাসন করতে হবে জন্ম ও শৈশব থেকে। স্কুল, যাতে সে পুঁজি শ্রমিক হতে পারে, হাসপাতাল যাতে তার স্বাস্থ্য ভালো হয়, নইলে সে কারখানায় খাটবে কী করে, মাল বানাবে কী করে? আর বাজারের আর পুঁজির নতুন শাসন যদি কেউ মানতে না চায় তার জন্যে পাগলাগারদ বা জেলখানা। রিজন — যুক্তি। তার বাইরে আর কেহ নাই কিছু নাই গো। আমাদের উত্তেজনা ও উত্থান ঘটল, নিদ্রোত্থিত আমরা অন্ধকার থেকে আলোয় এলাম। এনলাইটেনমেন্ট।

গোটা গ্রহটাই এই রিজনের শাসনে। যার অন্য নাম আমেরিকা। কারণ আমেরিকাই এই পুঁজির পীঠস্থান। দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ যখন সারা পৃথিবীকে ভিত্তার করে দিয়েছে আমেরিকা তখন দুপক্ষকেই মাল বেচেছে। তার নিজের ভূমিতে কোনো যুদ্ধই হয়নি। সারা গ্রহ থেকে আরো আরো পুঁজি স্থানান্তরিত হয়েছে আমেরিকায়। রিজনের পুঁজির আমেরিকার শাসনের বাইরে কোনোকিছুই আর রইল না।

কিন্তু তাই কী হয়? ফ্রয়েড আমাদের দেখিয়েছিলেন কী ভাবে আমাদের মনের বাসনার যে অংশগুলোকে আমরা যুক্তি দিয়ে সামাজিক শাসন দিয়ে অবরুদ্ধ করি, আটকাই, তারা কী ভাবে ফেরত আসে সিম্পটমের রোগলক্ষণের আকারে। লাকাঁ এই সিম্পটমকে দেখেছিলেন অবরুদ্ধ অযুক্তির মাথা নাড়িয়ে নিজেকে জানান দেওয়া হিশেবে।

ওসামা বিন লাদেন বা আমেরিকার উদ্ধত শিবলিঙ্গ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উপর আক্রমণ আসলে এইরকম একটা সিম্পটম। রিজনের শাসনের নিচে অবরুদ্ধ তৃতীয় বিশ্বের জ্যান্ত বাস্তবতার নিজেকে জানান দেওয়ার চেষ্টা। ঠিক ওই দাবা খেলার সাদা চালের সাপেক্ষে কালোর আত্মরক্ষা আত্ম-উচ্চারণের কালো চালের মত। নিজেকে জানান দেওয়ার চেষ্টা — তোমার এই অনামিকা উপনিবেশই শেষ কথা নয় — আমিও আছি গো। আমার মত করেই থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছি কোনোক্রমে। তুমি আমাকে আমার মত থাকতে দাওনি, তাই এই আমার প্রত্যাঘাত। পিতাকে আক্রমণ করে নিজেরই পিতৃত্ব জ্ঞাপন। এবং চারদিকে, অনেকের মধ্যেই, বিশেষত কলকাতার কমবয়েসি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাকান, লাদেনের প্রতি কাজ করছে এই নতুন মার্জিনাল পিতার প্রতি একটা অভিনন্দন। আমি সেন্টজেভিয়ার্সের অঙ্ক অনার্সের একটি ছাত্রীকে কোট করছি, 'কী সুইট দেখতে লাদেনকে, আর কী পাওয়ারফুল' — বাবার শিবলিঙ্গ সে ধসিয়ে দিয়েছে, আর একটু বেটার বাবা।

আমেরিকারই সিন্ডিকেটেড সাংবাদিক রবার্ট শিয়ার এলএ টাইমস-এ, সতেরোই সেপ্টেম্বর তার নিজের মত করে লিখেছেন হুবহু এই একই কথা, সো উই হ্যাভ কাম এ ফুল সার্কেল। "তাই, আমরা একটা সম্পূর্ণ বৃত্ত ঘুরে ফেরত এলাম। সিআইএ, যে আদতে শিক্ষিত করেছিল ওসামা বিন লাদেনকে এবং অন্যান্য আরো অজস্র আতঙ্কবাদীদের, তারা এবার আমাদেরই দিকে তাক করেছে। এবার আমরা আবার আমাদের ক্ষমতাকে আরো স্ফীত করে তুলব, এবং আবারো আরো বড় স্কেলে করব ওই একই কাজ। আরো আরো ওসামা বিন লাদেনের জন্ম দেব।" সাদার চাল, কালোর চাল, সাদার, কালোর, সাদার ... ।

আসুন, তার চেয়ে আমরা একটিবার এই সমতার এক বা দু নম্বর রূপকথার বাইরে এসে দাঁড়াই, একটু বড় হই, নিজেদের বলি, আসলে সমতা বলে কিছু হয় না। আমার প্রিয়তম মানুষটিকে, যখন তার বয়েস চার, আমি একবার ভারি প্রবঞ্চনা করেছিলাম। আমার কথা মানতে বাধ্য হওয়ার তার আপ্রাণ রুষ্টতায় তাকে একটু স্বান্ত্বনা দিতে বলেছিলাম, তুই তো আমার থেকে ধর বছর তিরিশেকের ছোট, তার মানে আর তিরিশ বছর পরেই তুই আমার সমান হয়ে যাবি, তখন আর কাউকে তোর মানতে হবে না। তাকে যে কথা বলিনি, আসুন একবার আমরা নিজেরা নিজেদের মনে পড়াই, সমতা বলে কিছু হয় না, নেই।

মাতৃগূঢ়ৈষা মাদার-কমপ্লেক্স আক্রান্ত হেগেল ভেবেছিলেন, ক্যাপিটালিজমে পৌঁছনো মানেই সারা পথের ক্লান্তি আর সারা দিনের তৃষা মিটিয়ে ফেলা, মাতৃগর্ভের মৌলিক আরাম। মার্ক্স সেই এলডোরাডোকে খুঁজে পেলেন কমিউনিজমে। সাম্যবাদে। গীতার অনিরাপত্তাবোধ তাড়িত কৃষ্ণ বলেছিল, মামেকং শরণং ব্রজ, তাহলেই তুমি নিত্যতা পাবে, আর সবই অনিত্য। আসুন আমরা বলি, নিত্যতা বলে কিছু হয় না, সমতা বলে কিছু হয়না, পথের শেষ বলে কিছু হয়না।

ক্ষমতা থাকবেই। আর ক্ষমতা তার গতিপথের একটা দিককে প্রভু করে অন্য দিকটাকে দাস। তাই প্রভু আর দাস থাকবেই। এটা মেনে নেওয়ার পরে, আসুন, আমরা আমাদের দাসত্বের আর একটু ভালো প্রভু হই। আমরা বলি, আমি তোমার ওয়েস্টের সমতা নামক গুংগা-যন্ত্রের পেছনে আর দৌড়ব না, আমি আমার উপর, আমার চারপাশের উপর অত্যাচারকে, যে নিজেকে অত্যাচারিত বলে মনে করে তার প্রতিরোধকে আরো একটু একটু করে বাড়িয়ে তুলি, যদি তা কোনোদিন মিলে যায় — যাবে। দাস যদি প্রভুকে আক্রমণ করে, তার দুটো রেজাল্ট হতে পারে, হয় দাস মরে যাবে, নয় প্রভু, সেক্ষেত্রে দাসই নতুন প্রভু হবে। প্রভুত্ব মরবে না, কিন্তু হতেই তো পারে এই নতুন দাসত্বে অত্যাচারের মাত্রা আগের দাসত্বের চেয়ে একটু কম। আবার নাও তো হতে পারে। কিন্তু প্রতিরোধ শেষ হবেনা, কারণ ক্ষমতাও তো শেষ হবেনা। আমি যদি ক্ষমতার প্রভুত্বের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে চাই, তাহলে, প্রথমেই আমাকে ক্ষমতার রূপকথার বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমার চেতনার উপরে ক্ষমতার প্রভুত্বের বাইরে গিয়ে।

নয়তো আমেরিকার এই খেলা সেটাকেই আমি বাড়িয়ে তুলব। হয় ভালো বুশ নয় কালো বুশ। আরো আরো অন্তহীন বুশ। মানে আমেরিকার খেলাটাকেই আমি বাড়িয়ে তুলব।

এখানে একটা অদ্ভুত হাস্যকর জায়গা তৈরি হচ্ছে আমাদের জন্যে। এমনকি এই ছোট্ট লেখাটাতেও। ইন্টারনেটে ফ্লোরা বলে একটা সংগঠন লোকের সাক্ষর সংগ্রহ করছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে। সেখানে একটা করে ছোট মন্তব্য দিতে হচ্ছে প্রত্যেককে। আমার মন্তব্যটা, যা হয়, আমার নিজের খুব ভালো লাগায় আমার এক বন্ধুকে শোনাই। সে বলল, একটা জায়গায় কী হাস্যকর ভাবোতো, আমাদের এই যে কোনো কথাই, ভালো হোক আর মন্দ হোক। কারণ আমাদের তো কিছুই করার নেই। তারপর সে বলল, তার ক্লাস-এইট পাঠরত মেয়ের সাংস্কৃতিক জগতেও মুসলিম বিদ্বেষ কী ভাবে ছড়িয়ে গেছে, যে এমনকি সমাজ সংসার দেশভাগ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেনা। সে জানছে মুসলিম মানেই টেররিজম, কারণ রিচ মেল হোয়াইট অ্যান্ড ক্রিশ্চিয়ান আমেরিকা তাই জানছে বা ভাবছে, এবং তা ছড়িয়ে যাচ্ছে অনন্ত খণ্ডে ছড়িয়ে থাকা মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে বহমান আমেরিকার অনামিকা উপনিবেশে। তিতলি, তার মেয়ে, সে জাপান জানেনা, ভিয়েতনাম জানেনা, ইরাক জানেনা, কিন্তু জানে লাদেন খারাপ, মুসলমান খারাপ।

এবং এই অনামিকা উপনিবেশগুলোয় পিতার বিশ্বস্ত পিতৃত্বে বেঁচে থাকার জন্যেই আমেরিকাকে প্রত্যাঘাত করতে হবে। হবেই। তার শিবলিঙ্গ ভাঙা কালাপাহাড়কেই যদি সে সবার সামনে ভালো করে ভেঙে দেখাতে না পারে, তাহলে কাল পরশু তার পরের দিন তার জলের নিচে মাথা লুকিয়ে রাখা আরো অনেক মগ্নমৈনাক মাথা চাড়া দিতে শুরু করবে। তার নিজের ভূখণ্ড জুড়ে প্রতিমূহূর্তে সে অবরুদ্ধ করে চলেছে আরো অনেক নির্মীয়মান কিন্তু অঘোষিত আইডেন্টিটিকে। যে বিশাল সংখ্যক কালো মানুষদের সে আটকে রেখেছে প্যাঁচ লাগানো রিজনের কৌটোয় তারাই বা আত্মঘোষণা করতে কতক্ষণ? তার গোটা পিতৃত্বটাই দাঁড়িয়ে আছে এই সর্বব্যাপী অবরোধের উপর। তার সহজ উদ্বৃত্ত জোগানো অনামিকা উপনিবেশেরা। তাকে তাই ভাঙতেই হবে লাদেনকে।

কালোর চাল তো ফের সাদারও পরবর্তী চালকে বদলে দেয়। তাই সাদাকে এবার চাল দিতেই হবে গোটা তৃতীয় বিশ্বের ভূগোল জুড়ে রণতরী আর বিমানবাহী জাহাজে ভরে দিয়ে। যেমন রণতরী দিয়ে একসময় সে তৃতীয় বিশ্ব জয় করেছিল। আরো কত বাচ্চা ঝলসে যাবে, যেমন ঝলসে গেছিল ভিয়েতনামে, মাত্র ফুট দশেক দূরে নিরাপদ কোলের দিকে দৌড়ে যেতে যেতেই তার পিঠের চামড়া ঝলসে খুলে উপড়ে যাবে তার পিঠ থেকে। আমাদের এই মুহূর্তে কিছু করার নেই।